৪) কালকেতু চরিত্র :—

→ মধ্যযুগীয় সমগ্র মঙ্গলকাব্য জুড়ে একজনই মাত্র স্রষ্টা নিজ বৈশিষ্ট্য ও গুনে ধ্রুব তারার ন্যায় সাহিত্যাকাশে উজ্জ্বল হয়ে আছেন তিনি কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম, এবং যা সম্ভব হয়েছে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা সূত্রে। তিনি মুকুন্দরাম এই বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে যে চরিত্র গুলি অঙ্কন করেছেন তা খুবই বিচিত্র, মানব চরিত্র চিত্রনে তিনি যে দক্ষতা, বাস্তবজ্ঞান ও দর্শন শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তাতে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরনীয় হয়ে আছেন। তার জলন্ত দৃষ্টান্ত হল কালকেতু। তাঁর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত || সমীপ অতীব দৃষ্টি যাদের হল কালকেতু

জ্বলন্ত অ্যারিস্টটলের মতানুসারে চরিত্র হল "দোষ-গুন সমন্বিত বাস্তব মানুষ", যা মধ্যযুগের সাহিত্যের ক্ষেত্রে অত্যাজ্য নয়। বস্তুত: ষোড়শ শতকের পরিবেশকে নিয়ে এমন বাস্তবরূপ সৃষ্টি করা মুকুন্দরামের মত প্রতিভাশালী কবির পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে কবি ভারতচন্দ্রের কথাও চলে আসে। এক্ষেত্রে ড: অসিত বন্দোপাধ্যায়ের মন্তব্য স্মরনীয় —

"ভারতচন্দ্র চরিত্র চিত্রনে ততটা সার্থক নহে যতটা ছন্দন কুলাকুলশী মুকুন্দরামের রচনা রীতিতে চারুত্ব ও বক্রতার অভাব আছে কিন্তু বিচিত্র চরিত্র-চিত্রনে সে ত্রুটি ঢাকিয়া গিয়াছে।"

P.T.O

উক্ত বক্তব্যটির সত্যতা ধরা পড়ে 'আখেটিক খণ্ডের' নায়ক কালকেতুর চরিত্র বিশ্লেষণে। নায়কের মতই কালকেতুর বীরত্ব। অমিত শক্তির অধিকারী ব্যাধ তনয় কালকেতু সমগ্র অরণ্য-এর পশুকুলে ত্রাস সৃষ্টি করেছেন এবং আখ্যানের শেষদিকে দেখতে পাই ধর্মকেতু কলিঙ্গরাজও তার কাছে পরাস্ত হয়েছেন। 'কালকেতুর মৃগয়া' অংশে তাঁর বীরত্বপূর্ণ চিত্র দেখতে পাই —

" অনুদিন পশু বধে বীর মহাবল।
কুরুরাজ সেনা যেন বধে বৃহন্নল ॥"

বাস্তববাদী কবি মুকুন্দরাম কালকেতুর চরিত্র ব্যাধি জাতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সন্নিবেশিত করে নির্মাণ করেছেন। কাব্যে আমরা দেখতে পাই কালকেতু পূর্বজন্মে ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর রূপে, কিন্তু মর্ত্যে একটি রক্তমাংসের গড়া মানুষরূপে স্থান পেয়েছে। পুত্র ও স্বামী এই দুই মানবীয় সম্বন্ধের অন্তরালে কালকেতু চরিত্র বৈশিষ্ট্যময়। পুত্র হিসাবে যেমন সে পিতামাতার অনুগত, দায়িত্বশীল তেমনি স্বামী হিসাবে কালকেতু আদর্শবান। স্ত্রী ফুল্লরাকে সে প্রাণ সর্বস্ব ভালোবাসে। তাই যেদিন শিকারে ব্যর্থ হয় সেদিন ফুল্লরার উদ্দেশ্য-এ কালকেতুর আক্ষেপ, শোনা যায় —

"দুখিনী ফুল্লরা মোর আছে প্রতি-আশে।
কি বলিয়া দাণ্ডাইব যেয়্যা তার পাশে ॥"

'কালকেতুর ভোজন' অংশে তাঁর ভোজনরসিকতার সুস্পষ্ট চিত্র পাই —

"চারি হাঁড়ি মহাবীর খায় খুদ জাউ।
ছয় হাড়ি মুসুরী সুপ মিশ্যা তথি লাউ ॥
ঝুড়ি দুই তিন খায় আলু আর ওল পোড়া।
কচুর সহিত খায় করঞ্জা আমড়া ॥"

P.T.O

ছদ্মবেশিনী দেবী চণ্ডীর আগমনকে কেন্দ্র করে ফুল্লরা কালকেতুর চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছে। কিন্তু কালকেতু এর তীব্র প্রতিবাদ করে পুরুষের সঠিক চারিত্রিক গুনাবলির প্রমাণ দিয়েছে ——

"এবোল শুনিয়া ক্রোধে বীর বলে বানী।
পরস্ত্রী দেখিয়া যেন নিজ জননী ॥"

কালকেতু মূর্খ ব্যক্তিময় হলেও সে সহজ বিষয় সহজ ভাবে বুঝতে জানে। দেবী প্রদত্ত আংটি যখন সে ঠগ ও সুচতুর বেনে মুরারী শীলের কাছে বিক্রয় করতে গিয়ে সঠিক মূল্য না পেয়ে, কোন তর্কের মধ্যে না গিয়ে চাতুর্যের সঙ্গে বলেছেন ——

"মূল্য মূল্য নাহি পাই
যে জন দিয়াছে ইহা তার ঠাঁই যাই।"

কাব্যে শেষাংশে কালকেতুকে আমরা পাই গুজরাট নগরের রাজা রূপে। রাজা হিসাবে তার মানবিকগুন ফুটে উঠেছে চক্রান্তকারী খল নায়ক ভাঁড়ুদত্তের বিচার অংশে। কালকেতুর সম্বন্ধে নানা চক্রান্ত সত্ত্বেও সে তার কাতর প্রার্থনা শুনে প্রান রক্ষা করেছে। কবিও প্রসঙ্গে বলেছেন ——

"ভাঁড়ুর লাগবে বীর দুঃখ ভাবে বড়ি।
কৃপা করি পুনর্বার দিল ঘরবাড়ি ॥"

সমগ্র কাব্যে কালকেতুর চরিত্রের যেসকল বৈশিষ্ট্য ও গুনাবলী ফুটে উঠেছে তা তার ব্যাধ জীবনের প্রতি সঙ্গতি রেখে। সোমভাগে কালকেতু রাজা হওয়া সত্ত্বেও মুরারী শীল ও ভাঁড়ু দত্তের চরিত্রই অধিক সজীব ও সক্রিয়। তবুও মধ্যযুগে বিস্ময়কর চরিত্র

কালকেতু চরিত্র — ৪

চিত্রনে মুকুন্দরাম যে দক্ষতা, বাস্তবজ্ঞান, দর্শনশক্তি ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তা বাংলা সাহিত্যে প্রশংসনীয়। তাইতো কোনো কোনো সমালোচক আচিরে বলেছেন ——

"মুকুন্দরাম যদি একালে জন্মাতেন তাহলে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক রূপে আখ্যা পেতেন।"